নজরুলগীতিতে উপজাতি-জীবনাশ্রিত প্রেম : একটি নান্দনিক মূল্যায়ন

তৌহিদ হোসেন [41]

বাংলা কাব্যগীতির ভুবনে রবীন্দ্রনাথ যদি হন সুউচ্চ বৃক্ষের কোকিল, তবে নজরুলও গুলবাগের বুলবুল । দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য গুনগত । কিন্তু নজরুল গীতির সুরবৈচিত্র্য ও বিষয় – বিস্তৃতি নিয়ে নানা আলোচনা হলেও নান্দনিক মূল্যায়ন বলতে যা বোঝায়, তা আজও পূর্ণরূপে হয়নি ।

এই ফাঁক পূরণ করার যোগ্যতা আমার নেই । আর এটা একজনের কাজও নয় । উপরন্তু, সুরের আকাশে আমি নেহাৎই এক উটপাখি, তাই এবিষয়ে আমার যে – কোনও আলোচনা খন্ডিত হতে বাধ্য ।

আপাতত আমার উপজীব্য নজরুল গীতিকুঞ্জের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ – বিশেষত যে – গান গুলির বিষয় উপজাতি – জীবনাশ্রিত প্রেম । এরকমই কিছু গান আমি আমার মর্জিমত কাজী অনিরুদ্ধ কৃত ‘সুর্নিবাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি’গ্রন্থটির খন্ডগুলি থেকে বেছে নিয়েছি ।

এ গুলির রচনাকাল অর্থাৎ কোনটি আগে কোনটি পরে তা আমার জানা নেই । তবে সব আলোচনারই একটা ভূমিকা থাকে । আমি তাই উপজাতি- জীবনাশ্রিত প্রেমসঙ্গীতের ঊষা-রাগিনী রূপে এই গানটি তুলে ধরছি –

শাল-পিয়ালের বনে গো
পাহাড়তলির কাছে ।
একটি ছেলে শিস দেয়, আর
একটি মেয়ে নাচে ।
সেই ছেলেটির বুনো স্বভাব ভারি
বাঁশির সাথে বর্শা-ধনুক-ধারী ।
সেই মেয়েটি দোলনা বেঁধে
দুলে মহুল গাছে ।

অতি সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত এই গানটি উপজাতি জীবনের মতোই নির্ভার ।

---

[41] Part-Time Lecturer in English, Balarampur College, Purulia, West Bengal.

শালপিয়ালের বনে, পাহাড়তলির কাছে দুটি কিশোর –কিশোরী । শৈশব –ক্রীড়ার মতো তাদের দেহমনের ছন্দ । চাপমুক্ত, জটিলতা- বর্জিত, উদ্দেশ্যহীন । আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে : কী–ই বা আছে গানটিতে। কিন্তু এ- সমস্ত না থাকার মধ্য দিয়ে আমরা যেন ফিরে পাই সভ্যতার প্রত্যুষ লগ্নটিকে । প্রাণের এই আরাম, এই আস্বাদই গানটির মুখ্য আবেদন । আর 'বুনো স্বভাব ভারি'-- শব্দগুচ্ছটিতে কী অব্যর্থভাবেই না তীব্র আরণ্যক যৌনতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । তার সঙ্গে ছেলেটি আবার 'বর্শা-ধনুক-ধারী' । অর্থাৎ যৌনক্ষুধার সমান্তরালে পেটের ক্ষুধা । কিন্তু মাঝখানে 'বাঁশি' শব্দের চকিত উল্লেখ এ দুটি ক্ষুধাকে পশুজগতের থেকে আলাদা করেছে । ফলত সে যোগ্য হয়েছে এক মনোময়ীর, যে 'দোলনা বেঁধে দুলে মহুল গাছে' ।

মূলত জীবিকার সূত্রেই উপজাতিদের মধ্যে বেশি-বেশি করে রুক্ষ, আদিম প্রবৃত্তির ধারক ব্যাধ ও বেদেরা । তাই ইনিয়ে- বিনিয়ে প্রেম –সূচনা তথা পূর্বরাগের আদিখ্যেতা তাদের ক্ষেত্রে বেমানান । যেমন — শিকারী-পুরুষের প্রেম-প্রস্তাব:

শোনরে নুপুর , পাহাড়তলির মেয়ে ।
খুশি হলাম দেখতে তোরে পেয়ে ।
বন-বরা শিকার এ যাব পঞ্চকোট পাহাড়ে ।
মোর তীর থেমে যায় বুনো পাখির
আঁখির পানে চেয়ে ।

মন-কেমন করা ভদ্রলোকি বালাই এখানে নেই । 'খুশি হলাম দেখতে তোরে পেয়ে'—বাক্যটিতে দুপুর –রোদের মতো অমার্জিত ও বলিষ্ঠ সারল্য । অথচ নায়ক আজ নারীর অন্বেষণে বের হয়নি, তার লক্ষ্য বুনো শুয়োর শিকার । 'বন-বরা শিকারে যাব পঞ্চকোটের পাহাড়ে'---কথাটি ঈষৎ ভিন্নভাবে দু'বার বলার মধ্যে শিকারীর সময়াভাব এবংউদ্দেশ্য-সাধনের ব্যগ্রতা প্রকাশিত । এর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তার ছিপছিপে ক্ষীপ্র পৌরুষকেও । অর্থাৎ যাকে দেখে সে খুশি হয়েছে সেই নারীকে তৃপ্ত করার মতো পৌরুষ তার আছে । কিন্তু তার মর্দানির পরিচয় যে তীর তা এখন বুনো পাখি অর্থাৎ মেয়েটির আঁখির দ্বারা বশীভূত । মোটকথা, তর সইছে না, এক্ষুনি এই মুহূর্তে নূপুর তার সঙ্গিনী হোক।

কথায় আছে নাগের চেয়ে নাগিনীর রাগ বেশি। যৌবন –রাগের ক্ষেত্রেও একথা সত্য । বিশেষত সাপ নিয়ে যাদের কারবার সেই বেদে-বেদেনীর ক্ষেত্রে । এরকম একটি গান:

বাঁকা ছুরির মতো বেঁকে
উঠল যে তোর আঁখি রে ।

ওরে বেদের দুলাল আমার সাথে
সাপ খেলবি নাকি রে ।
তোর জোড়া ভুরুর ধনুক আমি চিনি
পাখি আমি নই বেদিয়া, আমি যে সাপিনী ।
ভয় করিনা বাঁশিকে
ডর লাগে তোর হাসিকে ।
তোর মনের ঝাঁপিকে খোলা পেলে
সেথায় গিয়ে থাকি রে
সেথায় গিয়ে থাকি ।

অর্থাৎ ছুরির পালটা খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার । পুরুষটির ইচ্ছের তালে তালে সাপিনীর মতো হিলহিলে নৃত্যের বাসনা – এতো মিলনেরই জান্তব আহ্বান । যেহেতু সে পক্ষিণী নয়, সাপিনী, তাই বেদের দুলালের ভ্রূধনুতে যে মৃত্যুবাণ নেই, আছে মদনবাণ – তা ভালোভাবেই জানা । ভয় নেই মোহনবাঁশিকেও । কেননা সে তো ধরা দিতেই চায় । তাহলে হাসিকে ডর কেন ? মনে হয়, এই হাসির অর্থ আপাতত মেয়েটির কাছে এরকম : তোর বশীভূত আমি হইনি । অবশ্য বলাই বাহুল্য, 'ডর' ব্যাপারটা 'ভয়' – এরমতো ভয়ানক নয় । শেষ বাক্যটির ব্যঞ্জনা এই : হে পুরুষ, হেঁয়ালি রেখে তোর মনের দরজা উন্মুক্ত কর ।

এই রাগ শিল্পশ্রীমন্ডিত পাহাড়ি ঝরনার গতি পেয়েছে নীচের এই গানে:

এই রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
বাজে বাঁশের বাঁশি।
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো, মন লাগে না কাজে লো
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হল উদাসী লো ।
মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ উঠে দুলে (লো)
দোল্ লাগে শাল-পিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে (লো)
মহুয়াবনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাঁসি লো ।
চোখে ভালো লাগে যাকে-
তারে দেখব পথের বাঁকে,

তার চাঁচর কেশে পরিয়ে দেব ঝুমকো জবার ফুল
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানে দুল ।

তারে নাচের তালের ইশারাতে বলব ভলোবাসি লো ।

প্রেম এখানে উৎসব । গানটি একজনের, কিন্তু বাঁশি শুধু তার বুকের মধ্যেই বাজছে না –মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ দুলে উঠছে আরও অনেক জনের । রসিক ফোটোগ্রাফার যেমন একজনকে মাঝখানে রেখে সমবেত ছবি নেন, এক্ষেত্রেও তাই । গানটির মূল ভাব—অনির্দিষ্ট এক পুরুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা । এই আকাঙ্ক্ষা রক্তিম, তীব্র, বঙ্কিম ও পুষ্পিত । সান্ধ্য রাঙামাটির পথ আজ ঘামরক্তের প্রতীক নয়,তাতে হৃদয়ের রক্তিমাভা । তীব্রতা বাঁশির ডাকে, মাদলের তালে তালে, হৃৎস্পন্দনের ধক্ ধক্ ধ্বনিতে । এই ধক্ ধক্ ধ্বনি ব্যঞ্জিত তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে । পরের ছত্রে এই হৃৎধ্বনিই প্রসারিত দেহধ্বনিতে:'মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে'। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে প্রাকৃত নারীর নৃত্যে প্রকৃতির সঙ্গতদানের চিত্র: "দোল লাগে শালপিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে(লো)/মহুয়াবনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো।" এই আকাঙ্খা বঙ্কিম কেন ? কেন না--- "চোখে ভালো লাগে যাকে--/তারে দেখব পথের বাঁকে"। আর তাকে "ভালোবাসি" বলব "নাচের তালের ইশারাতে"। এই বক্রতা উপজাতীয় মেয়েটির নিলাজ কামনাকে রহস্যমণ্ডিত করেছে—যে রহস্য চিরন্তন নারীপ্রেমের অপরিহার্য অঙ্গ । আবার এ প্রেম নজরুলীয় ভুবনের, সুতরাং ফুল না হলে চলে ? আলোচ্য গানেও প্রেমের দেওয়া নেওয়া তাই ফুলে-ফুলে : 'তার চাঁচর কেশে পরিয়ে দেব ঝুমকো জবার ফুল/তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল ।'এই আকাঙ্খারই তীব্রতম,বলা যায় বিষজর্জর রূপ আমরা দেখি পরবর্তী গানে:

নাচের নেশায় ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢুলে লো!
নয়ন পড়ে ঢুলে ।
বুনো ফুল পড়ল ঝরে নাচের ঘোরে
দোলন খোঁপা খুলে লো
দোলন খোঁপা খুলে ।।

শুনে ঐ মাদল বাজা
নাচে চাঁদ রাতের রাজা
নাচে লো নাচে
শালুকের কাঁকাল ধরে তালপুকুরের

জলে হেলে দুলে লো
জলে হেলে দুলে।।

আউরে গেল ঝুমকো জবা
লেগে গরম গালের ছোঁওয়া
বাঁশি শুনে ঘুমায় মনে
কয়লা খাদের ধোঁওয়া লো
কয়লা খাদের ধোঁওয়া ।।
সই, নাচ ফুরালে ফিরে ঘরে
রাত কাটাব কেমন করে লো ।
পড়বে মনে বাঁশুরিয়ার
চোখ দুটি টুল টুলে লো
চোখ দুটি টুলটুলে ।।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এর পঙক্তিসজ্জা । এক-একটি পঙক্তি যেন উঠে দাঁড়িয়ে আবার এলিয়ে পড়েছে । ঠিক নর্তকীটির মতো । বুকের ভিতর মিলন- কামনার কালসাপ তাকে ছোবল মেরেছে । যণত্রণায় সে অস্থির, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হচ্ছে—লতার মতো মেয়েটি আশ্রয় চাইছে বাঁশুরিয়ার দেহকান্ডে, ডালে- পাতায় । ফলে ঢুলে পড়ছে নয়ন, খোঁপা খুলে ঝরে পড়েছে বুনো ফুল । আগের গানটির মতো এখানেও হাজির চাঁদ—তবে নিছক মাতাল হয়ে নয়, এই প্রেমরজনীতে তার আর্বিভাব রাজবেশে । কাঁকাল ধরে তার নৃত্য মেয়েটির বিষজর্জর অবস্থাকে আরো অসহণীয় করে তুলেছে । এই মিলন-জর্জরতা ধরা পড়েছে একটি অনুপম চিত্রকল্পে: 'আউরে গেল ঝুমকো জবা/লেগে গরম গালের ছোঁওয়া'। ফোড়া ফুলে উঠে টাটাতে শুরু করলে আমরা বলি 'অউরাচ্ছে'। তখন ব্যথা প্রশমনের জন্য কেটে বাদ দিতে হয় । সবচেয়ে মার্ধুযমণ্ডিত অঙ্গ গণ্ডদ্বয়ের ছোঁয়া লেগে ঝুমকো জবার যখন এই অবস্থা, তখন দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের আবরণ-আভরণের অবস্থা সহজেই অনুমেয় ।

কয়লা খাদের ধোঁয়া দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। মেয়েটির মনের খাদানে ধোঁয়া উঠেছে । কিন্তু আপাতত সেখানে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে না তার কারণ বাঁশির সুর । অর্থাৎ অস্থির হলেও তার মন সুরের বাঁধনে বাঁধা।

কিন্তু একটু পরেই তো নাচ ফুরাবে- অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে- তখন ? রাত কাটবে কেমন করে ! কী করে ভুলবে মেয়েটি বাঁশুরিয়ার টুলটুলে দুটি চোখের অমোঘ আহ্বান ।

যাই হোক, এধরণের গান হয়তো আরো লিখেছেন নজরুল । কিন্তু আপাতত যে গ্রন্থটির ওপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ, তাতে এই পাঁচটিকেই উপজাতি- জিবনাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত বলে মনে হয়েছে । বলাবাহুল্য, ওই গ্রন্থেরই আরো কিছু প্রেমের গানে আছে উপজাতীয় স্বাদ-গন্ধ । কিন্তু

সেগুলিকে বিশুদ্ধভাবে উপজাতি – জীবনাশ্রিত বলা যায় না । সেগুলি মিশ্র ধরণের । তাদের লোকজীবানাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত বলাই ভালো ।

সবমিলিয়ে এইগুলিতে গীতিকার নজরুলের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ :

১. ‘শাল-পিয়ালের বন’, ‘পঞ্চকোট পাহাড়’, ‘রাঙামাটির পথ’, ‘কয়লাখাদের ধোঁওয়া’ ইত্যাদি দেখে মনে হয় এই গানগুলির স্থানিক পটভূমি আজকের ঝাড়খণ্ড-সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ । যা নজরুলের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিবিড় লীলাভূমি । অর্থাৎ উপজাতি- জীবানাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুল প্রত্যক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করেছেন । সেজন্য এই গানগুলিতে নজরুলীয় উজ্জ্বল-রঙিন কল্পনার অভাব থাকলেও খনি থেকে সদ্য তোলা সোনার গাঢ় সজীবতা আছে ।

উপজাতি-জীবনাশ্রিত প্রেম তাঁর গানে নিছক উপাদান মাত্র নয় । কিংবা আত্মপ্রসারের জন্য রোমান্টিক কবিরা যেমন করে এ-ধরণের বিষয় চয়ন করেন, তেমনটা নজরুলের ক্ষেত্রে ঘটেনি । এসবের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ । গানগুলির আন্তরিকতা, ভাবাবেগের তীব্রতা ও চরিত্রগুলির রক্তচাঞ্চল্য তার প্রমাণ । উল্টো দিক থেকেও ভাবা যেতে পারে যে : নজরুল-প্রেম-সঙ্গীতের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তত্ত্বভারহীনতা, কাম-প্রেমের তীব্রতা, গভীরতা-চটুলতা --- তার মধ্যে কি এই পড়শি উপজাতিদের প্রভাব নেই ? অর্থাৎ সংখ্যায় কম হলেও নজরুলের উপজাতি-জীবনাশ্রিত প্রেমসঙ্গীত গভীর মনোযোগ দাবি করে ।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. ‘সুর্নিবাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি’ (১ম খন্ড), কাজী অনিরুদ্ধ, সাহিত্যম্ , কোলকাতা—৭৩, মহালয়া - ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

২. ঐ (২য় খন্ড), শ্রাবণ - ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

৩. ঐ (৩য় খন্ড), বৈশাখ - ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

৪. ঐ (৪র্থ খন্ড), আশ্বিন - ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

৫. ঐ(৫ম খন্ড), ...

৬. ‘নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্প ’, ক্ষেত্র গুপ্ত, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা-৯, জানুয়ারি-১৯৯৭

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ম্বর সভা : সেকাল একাল